দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রমিত বলি প্রমিত লিখি

১ম পরিচ্ছেদ

ধ্বনির উচ্চারণ

উচ্চারণ ঠিক রেখে কবিতা পড়ি

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (১৯৩৪-২০০১) বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট কবি। তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতার বইয়ের নাম 'সাত নরী হার', 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি' ইত্যাদি। নিচের কবিতাটি ভাষা-আন্দোলন বিষয়ক একটি বহুল পঠিত কবিতা। এটি কবির 'সাত নরী হার' কাব্য থেকে নেওয়া।

কবিতাটি প্রথমে নীরবে পড়ো; এরপর সরবে পাঠ করো। সরবে পাঠ করার সময়ে ধ্বনির উচ্চারণে সতর্ক থাকতে হবে।

মাগো, ওরা বলে

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

'কুমড়ো ফুলে-ফুলে
নুয়ে পড়েছে লতাটা,
সজনে ডাঁটায়
ভরে গেছে গাছটা,
আর, আমি ডালের বড়ি
শুকিয়ে রেখেছি—
খোকা তুই কবে আসবি!
কবে ছুটি?

চিঠিটা তার পকেটে ছিল,
ছেঁড়া আর রক্তে ভেজা।

'মাগো, ওরা বলে,
সবার কথা কেড়ে নেবে
তোমার কোলে শুয়ে
গল্প শুনতে দেবে না।
বলো, মা, তাই কি হয়?

তাইতো আমার দেরি হচ্ছে।
তোমার জন্য কথার ঝুড়ি নিয়ে
তবেই না বাড়ি ফিরব।
লক্ষ্মী মা রাগ কোরো না,
মাত্র তো আর কটা দিন।

‘পাগল ছেলে’,
মা পড়ে আর হাসে,
‘তোর ওপরে রাগ করতে পারি!

নারকেলের চিড়ে কোটে,
উড়কি ধানের মুড়কি ভাজে
এটা সেটা আরো কত কী!
তার খোকা যে বাড়ি ফিরবে!
ক্লান্ত খোকা!

কুমড়ো ফুল
শুকিয়ে গেছে,
ঝরে পড়েছে ডাঁটা;
পুঁই লতাটা নেতানো,
'খোকা এলি?'—
ঝাপসা চোখে মা তাকায়
উঠোনে, উঠোনে
যেখানে খোকার শব
শকুনিরা ব্যবচ্ছেদ করে।

এখন,
মার চোখে চৈত্রের রোদ
পুড়িয়ে দেয় শকুনিদের।
তারপর,
দাওয়ায় বসে
মা আবার ধান ভানে,
বিন্নি ধানের খই ভাজে,

খোকা তার কখন আসে!
কখন আসে!

এখন,
মার চোখে শিশির ভোর,
স্নেহের রোদে
ভিটে ভরেছে।

শব্দের অর্থ

উড়কি ধান: এক রকম ধান।

কথার ঝুড়ি: অনেক কথা।

ঝাপসা চোখে: অস্পষ্ট দৃষ্টিতে।

ডালের বড়ি: ডাল দিয়ে বানানো ছোটো বড়া।

দাওয়া: ঘরের বারান্দা।

নারকেলের চিড়ে: চিড়ার মতো করে বানানো নারকেলের টুকরা।

নুয়ে পড়া: ঝুলে পড়া।

বিন্নি ধান: এক রকম ধান।

ব্যবচ্ছেদ: কাটা-ছেঁড়া।

ভিটে: বাসভূমি।

মুড়কি: গুড় দিয়ে মাখানো খই।

শব: মৃতদেহ।

ধ্বনির কম্পনমাত্রা ও বায়ুর প্রবাহ অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনি

ধ্বনির কম্পনমাত্রা অনুযায়ী বিভাজন

ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে স্বরযন্ত্রে বায়ুর কম্পন কমবেশি হওয়ার ভিত্তিতে ব্যঞ্জনধ্বনিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: ঘোষ ও অঘোষ।

ঘোষ ব্যঞ্জন: যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে স্বরযন্ত্রে কম্পন অপেক্ষাকৃত বেশি হয়, সেসব ধ্বনিকে বলে ঘোষধ্বনি।

যেমন: গ, ঘ, জ, ঝ, ড, ঢ, ড়, ঢ়, দ, ধ, ন, ব, ভ, ম, র, ল।

অঘোষ ব্যঞ্জন: যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে স্বরযন্ত্রে কম্পন অপেক্ষাকৃত কম হয়, সেসব ধ্বনিকে বলে অঘোষধ্বনি।

যেমন: ক, খ, চ, ছ, ট, ঠ, ত, থ, প, ফ, শ, স, হ।

ধ্বনি সৃষ্টিতে বায়ুর প্রবাহ অনুযায়ী বিভাজন

ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে বায়ুপ্রবাহের বেগ কমবেশি হওয়ার ভিত্তিতে ব্যঞ্জনধ্বনিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ।

অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জন: সেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ফুসফুস থেকে নির্গত বায়ুপ্রবাহের মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম, সেগুলোকে বলা হয় অল্পপ্রাণ ধ্বনি।

যেমন: ক, গ, চ, জ, ট, ড, ড়, ত, দ, প, ব, শ, স।

মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন: সেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ফুসফুস থেকে নির্গত বায়ুপ্রবাহ অপেক্ষাকৃত বেশি, সেগুলোকে বলা হয় মহাপ্রাণ ধ্বনি।

যেমন: খ, ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, ঢ়, থ, ধ, ফ, ভ, হ।

২.১.১ কম্পনমাত্রা ও বায়ুপ্রবাহ অনুযায়ী ধ্বনির উচ্চারণ

‘মাগো, ওরা বলে’ কবিতা থেকে কিছু শব্দ নিচের তালিকায় দেওয়া হলো। লালচিহ্নিত বর্ণগুলো উচ্চারণ করে এগুলোর বৈশিষ্ট্য যাচাই করো এবং ছকে লেখো। কাজ শেষে সহপাঠীদের সঙ্গে নিজের উত্তর মেলাও, আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো। নিচে দুটি নমুনা-উত্তর করে দেওয়া হলো।

শব্দ	লাল চিহ্নিত বর্ণটির ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য
কুমড়ো	অঘোষ অল্পপ্রাণ
ফুল	অঘোষ মহাপ্রাণ
লতা	
ডাঁটা	
গাছ	
ছুটি	
পকেট	
ভেজা	
দেরি	
কথা	
পাগল	
মুড়কি	

বাক্‌প্রত্যঙ্গ

ধ্বনি উচ্চারণে যেসব প্রত্যঙ্গ সরাসরি কাজ করে সেগুলোকে বাক্‌প্রত্যঙ্গ বলে। এখানে বাক্‌প্রত্যঙ্গের ছবি দেওয়া হলো।

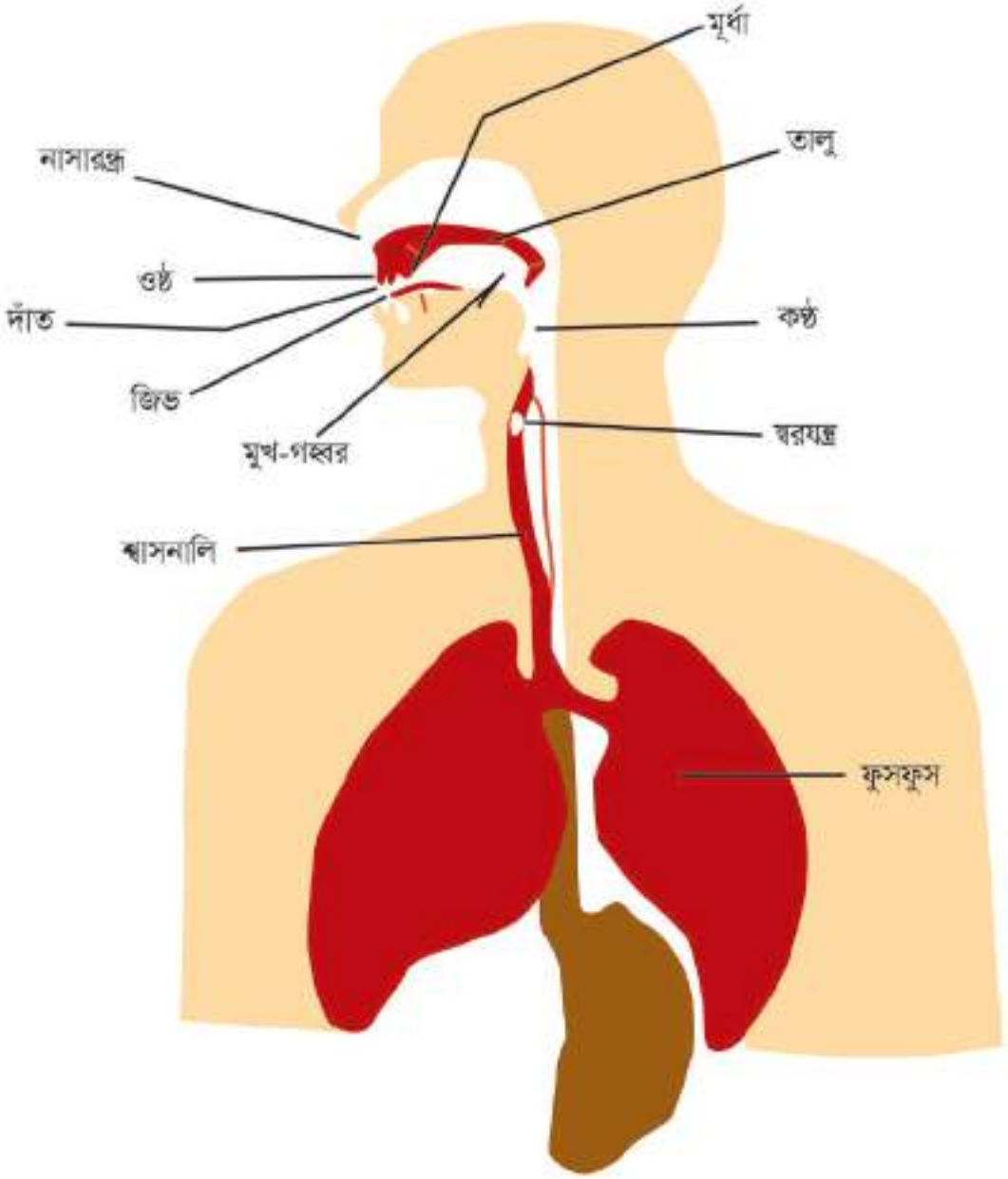

২.১.২ ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে বাক্‌প্রত্যঙ্গের সক্রিয়তা

নিচের ছকের লালচিহ্নিত বর্ণগুলো উচ্চারণ করো। উচ্চারণের সময়ে কোন বাক্‌প্রত্যঙ্গ ব্যবহৃত হচ্ছে তা বোঝার চেষ্টা করো এবং ছকের নির্দিষ্ট জায়গায় লেখো। কাজ শেষে সহপাঠীদের সঙ্গে নিজের উত্তর মেলাও, আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো। একটি নমুনা-উত্তর করে দেওয়া হলো।

শব্দ	কোন বাক্‌প্রত্যঙ্গ ব্যবহৃত হচ্ছে (কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা, দন্ত, ওষ্ঠ)
কুমড়ো	কণ্ঠ
ফুল	
লতা	
ডাঁটা	
গাছ	
ছুটি	
পকেট	
ভেজা	
দেরি	
কথা	
পাগল	
মুড়কি	

উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনি

বাক্‌প্রত্যঙ্গের যে জায়গায় বায়ু বাধা পেয়ে ব্যঞ্জনধ্বনি সৃষ্টি করে, সেই জায়গাটি হলো ঐ ব্যঞ্জনের উচ্চারণস্থান। উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়: ১. কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন, ২. তালব্য ব্যঞ্জন, ৩. মূর্ধন্য ব্যঞ্জন, ৪. দন্ত্য ব্যঞ্জন, ৫. ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন।

ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে কোন বাক্‌প্রত্যঙ্গের অংশগ্রহণ মুখ্য এবং কোন বাক্‌প্রত্যঙ্গের অংশগ্রহণ গৌণ, নিচের ছকে তা দেখানো হলো:

ধ্বনি	মুখ্য বাক্‌প্রত্যঙ্গ	গৌণ বাক্‌প্রত্যঙ্গ
কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন	জিভের পিছনের অংশ	নরম তালু
তালব্য ব্যঞ্জন	জিভের সামনের অংশ	শক্ত তালু
মূর্ধন্য ব্যঞ্জন	জিভের ডগা	মূর্ধা
দন্ত্য ব্যঞ্জন	জিভের ডগা	উপরের পাটির দাঁত
ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন	নিচের ঠোঁট	উপরের ঠোঁট

কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন: যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভের পিছনের অংশ উঁচু হয়ে আলজিভের কাছাকাছি নরম তালুর কাছে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন বলে। কাকা, খালু, গাছ, ঘাস, কাঙাল প্রভৃতি শব্দের ক, খ, গ, ঘ, ঙ কণ্ঠ্য ব্যঞ্জনের উদাহরণ।

তালব্য ব্যঞ্জন: যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভের ডগা খানিকটা প্রসারিত হয়ে শক্ত তালুর কাছে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে তালব্য ব্যঞ্জন বলে। চাচা, ছাতা, জাল, ঝড়, শসা প্রভৃতি শব্দের চ, ছ, জ, ঝ, শ তালব্য ব্যঞ্জনের উদাহরণ।

মূর্ধন্য ব্যঞ্জন: দন্তমূল এবং তালুর মাঝখানে যে উঁচু অংশ থাকে তার নাম মূর্ধা। যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভের ডগা মূর্ধার সঙ্গে লেগে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে মূর্ধন্য ব্যঞ্জন বলে। টাকা, ঠেলাগাড়ি, ডাকাত, ঢোল, গাড়ি, মূঢ় প্রভৃতি শব্দের ট, ঠ, ড, ঢ, ড়, ঢ় মূর্ধন্য ব্যঞ্জনের উদাহরণ।

দন্ত্য ব্যঞ্জন: যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভের ডগা উপরের পাটির দাঁতে লেগে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে দন্ত্য ব্যঞ্জন বলে। তাল, থালা, দাদা, ধান প্রভৃতি শব্দের ত, থ, দ, ধ দন্ত্য ব্যঞ্জনের উদাহরণ।

ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন: যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট দুটি কাছাকাছি এসে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন বলে। পাকা, ফল, বাবা, ভাই, মা প্রভৃতি শব্দের প, ফ, ব, ভ, ম ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জনের উদাহরণ।

২.১.৩ উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ধ্বনির প্রকার

‘মাগো, ওরা বলে’ কবিতা থেকে কিছু শব্দ নিচে দেওয়া হলো। শব্দগুলোতে যেসব বর্ণ ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলোর উচ্চারণস্থান বোঝার চেষ্টা করো। এরপর উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ধ্বনিগুলোর প্রকার লেখো। একটি নমুনা উত্তর করে দেখানো হলো।

শব্দ	উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ধ্বনির প্রকার
কুমড়ো	ক—কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন, ম—ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন, ড়—মূর্ধন্য ব্যঞ্জন
ফুল	
লতা	
ডাঁটা	
গাছ	
ছুটি	
পকেট	
ভেজা	
দেরি	
কথা	
পাগল	
মুড়কি	

২য় পরিচ্ছেদ

শব্দের উচ্চারণ

শওকত আলী (১৯৩৬-২০১৮) বাংলাদেশের একজন কথাসাহিত্যিক। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসের মধ্যে ‘প্রদোষে প্রাকৃতজন’, ‘দক্ষিণায়নের দিন’, ‘কুলায় কালস্রোত’, ‘পূর্বরাত্রি পূর্বদিন’ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। নিচের গল্পাংশটুকু তাঁর ‘যাত্রা’ উপন্যাস থেকে নেওয়া হয়েছে।

যাত্রা

শওকত আলী

হুড়োহুড়ি পাড়াপাড়ি করে নৌকায় উঠছে।

—আস্তে আস্তে, ভিড় কইরো না, আর উইঠেন না—নাও ডুববো কইলাম।

কিন্তু কেউ কারো কথা শোনে না।

এই মাঝি, এদিকে আনো—ধমকে উঠল কেউ। ওদিকে আরেকটা নৌকা আসছে, ওদিকে যান না ভাই—ধীরে সুস্থে কাজ করুন।

নৌকাটা ডুবো ডুবো অবস্থায় ছাড়ল। প্রফেসরের স্ত্রী চশমা চোখে, দু চোখে কালি পড়েছে নির্ঘুম রাতের। বাচ্চা দুটি কখনো নৌকায় চাপেনি—নৌকার দুলুনিতে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল। এক বুড়ি চিৎকার করতে শুরু করল—রাখাইল্যা রইয়া গেলো, নাও ঘুরাও, বাবারা নাওডারে ঘুরাইতে কও, আমার রাখাইল্যা রইয়া গেলো। বুড়ির কথা শোনে না কেউ।

প্রফেসরের বাচ্চা দুটি কাঁদছে ভয় পেয়ে, তাদের কথাও শোনে না কেউ। পায়ের ব্যথাটা ভয়ানক টনটন করছে এখন। এতক্ষণ টের পায়নি। এবার পায়ের ওপর হাত বোলাল। হাতের ব্যথার জন্যে চিন্তা নেই। হাতটা তো কোনো কাজে লাগছে না। পা-টা টেনে নিয়ে চলতে হবে—এটাই সমস্যা।

পেছনে তাকায় না কেউ। অথচ পেছনে পিলপিল করে মানুষ নেমে আসছে নদীর ঘাটে। কাকুতি মিনতি করছে নৌকার জন্যে। কিন্তু মাত্র ক খানি তো নৌকা—মাঝিদের পয়সা চাইতে হয় না, সওয়ারিরাই দাম হাঁকছে—দশ টাকা দেবো, এদিকে এসো। তবে ঐ হাঁকডাকই সার। কারো কথা শোনার জন্যে কেউ বসে নেই। স্বেচ্ছাসেবক কয়েকজন ছয়তারা মার্কা টুপি মাথায় হাঁকছে—কেউ বেশি পয়সা নেবে না। যা রেট তার এক পয়সাও বেশি নয়।

কিন্তু সম্মিলিত শব্দ আর কোলাহল শুধু। পেছনে তাকায় না কেউ। শুধু অধীর আগ্রহ, নৌকা এখন তীর ছোঁবে। প্রফেসর গিন্নি কী ভাবছেন যেন। তাঁর হাতে ঘড়ি বালা চুড়ি সব একসাথে শোভা পাচ্ছে। বোধহয় অনিশ্চিত পথের কথা ভেবে ঐ রকম জিনিসপত্র হাতে একসঙ্গে ঢুকিয়ে নিয়েছেন। প্রফেসরও সামনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, এবার ডাইনে-বাঁয়ে তাকিয়ে নিলেন একবার। দেখছেন সামনে, তীরে অসংখ্য লোক দাঁড়িয়ে। পরিচিত মুখ দেখে কেউ কেউ উদ্বিগ্ন স্বরে স্বজনের খোঁজ করছে। আমার ভাই আনসারকে দেখেননি? ও তো ইসলামপুর ফাঁড়ির পেছনের বাড়িটাতে থাকত। আহা নয়াবাজারের কাঠগোলায় মনোহর থাকে, তারে দেহো নাই? কী-ই, সব জ্বালাইয়া দিছে, আহারে। হালারা জানোয়ার নাকি! ঢাহা থুইবো না। আল্লায় বিচার করবো—আল্লার মাইর দুনিয়ার বাইর, দেইখ্যেন। শ্যাক সায়েবের খবর জানেন কিছু? ছাত্রগো সবাইরে নাকি মাইরা ফালাইছে?

কত কথা, কত জিজ্ঞাসা, কেউ উত্তর দিতে পারে না। হাসানকে জিজ্ঞেস করে প্রফেসর রায়হান বলেন, কী ভাই, পারবে তুমি?

জি, পারব। হাসান জবাব দেয়। পায়ের জখম বেশি নয়। হাতটা জখম হয়েছে বেশি—তা হাতের তো কোনো কাজ নেই এখন।

নৌকা ভিড়তেই লাফ দিয়ে নামতে শুরু করল সবাই। কারো তর সয় না। রায়হান স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, পারবে নামতে?

স্ত্রী কিছু বললেন না, পা নামিয়ে দিলেন পানিতে, প্রায় হাঁটু পর্যন্ত উঠে গেল কাপড়। নিচের দিকে বুঝি বা কিছুটা ভিজল। একটি বাচ্চাকে কোলে নিলেন, তারপর উঠে গেলেন তীরে। পেছনে আরেকটি বাচ্চাকে নিয়ে প্রফেসর রায়হান, হাঁটু পর্যন্ত প্যান্ট ভেজা। হাসান পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল, পরের নৌকায় তিনটি মেয়ে। ওর মধ্যে

একজনকে চিনল, ইউনিভার্সিটির মেয়ে, সহপাঠী—আর বাকি দুজন, কে জানে, হয়তো ইউনিভার্সিটিরই। সবার চোখে শূন্য দৃষ্টি। রাখালের মা কখন নৌকা থেকে নেমে গেছে, কারো চোখে পড়েনি।

কোত্থেকে আসছেন ভাই? রাজারবাগ? কী খবর ঢাকার? আচ্ছা, শান্তিনগর এলাকা কি এফেক্টেড?

কোন জায়গা এফেক্টেড নয়! কত লোক মেরেছে? যাকে প্রশ্ন করা হয় সে উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করে না। অন্য লোক দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ওঠে—যান মিয়া, দেইখ্যা আহেন—মস্করা করতে আইছেন, হুঃ! কেউ বলে, বলা যায় না—পাঁচ হাজার হতে পারে, দশ হাজার, পনেরো হাজার—সব রকমের হতে পারে।

স্যার আপনি?

ছাত্র দেখতে পেয়ে রায়হানের মুখে প্রথম হাসি ফোটে।

এদিকে কোথায় যাবেন? কোনো আত্মীয় আছে এদিকে? বড়ো বাচ্চাটিকে কোলে তুলেই বলে ওঠে, একি স্যার, এর গায়ে যে জ্বর! বিনু মৃদু গলায় জানান, হ্যাঁ ভাই, দুজনেরই জ্বর—তবু ওদের যে বাঁচিয়ে নিয়ে আসতে পেরেছি, তাই ভাগ্যি।

ভাববেন না ভাবি, ছেলেটি আশ্বাস দিতে চায়। বলে, এখানে আর কোনো ভয় নেই। এপারে ওরা আসতে সাহস পাবে না—আমরা প্রিপেয়ার্ড। হাত তুলে দেখায় ছেলেটি চারদিকে। রায়হান দেখেন, বিনু দেখেন। দেখেন শুধু, কিছু বলেন না। ম্লান হাসি ফোটে দুজনের মুখে।

হাসানেরও হাসি পায়। শটগান কয়েকটা, আর গোটা তিনেক ৩০৩ রাইফেল নিয়ে কয়েকটি ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমগাছ তলায়। কয়েকজনের হাতে শুধুই বাঁশের লাঠি। হাসি পায় শুধু, কোনো মন্তব্য করে না।

ইতিমধ্যে পরের নৌকা দুটিও এসে পৌঁছেছে। নেমে আসছে মানুষ। ঐ দেখো ওপারে একটা নৌকা কাত হয়ে উলটে গেল একেবারে। বুড়িগঙ্গায় এখন ধীর স্রোত। মরা খালে সবুজ রঙের পানি। গালাগাল দিচ্ছে একজন। হুড়মুড় করে দুটি তরুণ নৌকা থেকে নেমে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছে। মুখে বলছে—চিন্তা নাই, খালি ঢাকা শহর অগো হাতে, ইদিক চিটাগাং খুলনা সব জেলা স্বাধীন হইয়া গেছে। আমাগো যাইতে দেন, রাস্তা ছাড়েন।

ছেলে দুটির পরনে লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি, একজনের গলায় লাল রুমাল বাঁধা—কোমরে গুলির বেল্ট। সেখানে কমলা রঙের এলি কোম্পানির কার্ট্রিজ ভর্তি, হাতে একনলা বন্দুক—বন্দুকের বেল্ট নেই, একটা সরু দড়ি দিয়ে বাঁধা। পান চিবোচ্ছে দুজনে। আসগার ওদের দিকে তাকিয়ে রায়হানকে বলে, দেখছেন তো স্যার—চারদিক থেকে আসছে এরা—সব জমা হচ্ছে এপারে।

খাড়া পাড়, উঠতে কষ্ট হয়। হাতে প্লাস্টিকের ব্যাগটা এখনই ভারী লাগছে। বিনুর কষ্ট হচ্ছে—শুধু স্যান্ডেলজোড়া হাতে, কিন্তু তবু কষ্ট হচ্ছে। রায়হানের ইচ্ছে হয় গিয়ে হাতটা ধরেন। কিন্তু পারেন না। ওদিকে তর তর করে অন্যান্য মেয়ে-পুরুষ পাড় বেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। একটি তরুণী মেয়ে ওড়না গলায় ঝোলানো—নিচ থেকে টেনে তোলার জন্যে হাত বাড়িয়ে হাসিমুখ একটি তরুণকে ডাকছে।

পাড় বেয়ে ওপরে উঠতে বাচ্চা দুটির পা পিছলে যেতে চায়। পুরনো কেডসের তলায় রবারের ভোঁতা খাঁজে

ভেজা বালি আটকাতে পারে না। অবশ্য আসগার শক্ত হাতে ওদের ধরে আছে। রায়হান পেছনে আর একবার তাকিয়ে নিলেন।

আহা ছেলেটির বড়ো কষ্ট হচ্ছে বোধহয়। দেখা গেল বাঁ পায়ে ভর দিতে পারছে না। একটি মেয়ের সঙ্গে কী যেন কথা হলো। বাকি মেয়ে দুটি ততক্ষণে ওপরে উঠে এসেছে।

ওদিকে উত্তরে শহরের আকাশে এখনও ধোঁয়ার কুণ্ডলী। ডাইনে থেকে বাঁয়ে, গোনা যায় আজ—একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা—ঐ যে আরেকটা, এদিকে বাঁয়ে আবার আরেকটা আরম্ভ হচ্ছে। তবু গোনা যায়। গতকাল গোনা যেত না। আহা ছেলেটি পড়ে যাবে না তো!

আসগার এগিয়ে যেতেই ডান হাত বাড়িয়ে হাসান তাকে ধরল। ধরে নিজের পতন সামলে নিল। কোনো রকমে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, একটু ধরুন ভাই।

এখানে মানুষকে মানুষ উদার সাহায্য করছে। কিন্তু একটু দূরে নদীর ওপারেই কারো দিকে ফিরে তাকাবার অবকাশ নেই কারোর। অন্তত গতকাল ছিল না। এখনো থেকে থেকে রাইফেলের শব্দ শোনা যাচ্ছে—গ্রেনেড ফাটছে কোথাও কোথাও। ঐ ধোঁয়ার কুণ্ডলীগুলোর প্রত্যেকটি জ্বলে ওঠার সময়ে মেশিনগানের গুলি চলেছে, গ্রেনেড ফেটেছে। গতকাল ঐ কাণ্ড যে কত হয়েছে, কেউ হিসেব রাখেনি। আজও কি রাখা হচ্ছে? কে জানে!

হাসান বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয় উঁচু পাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে। এমনিতে ইচ্ছে করছে না হাত-পা নাড়াতে। লালবাগ থেকে বেরোবার সময়ে তপন আর কায়সার বলে দিয়েছে—খবরদার কোথাও থামবি না, দশ-পনেরো মাইল ইন্টিরিয়ারে গিয়ে তবে অন্য কথা। নদীর ওপারেও শালারা হামলা করবে।

হাসান হঠাৎ ভাবল, একটু পানি পেলে হতো। মুখটা তেতো তেতো লাগছে। বোধহয় জ্বরটা আবার আসছে। ডক্টর মজুমদার বলে দিয়েছেন—জ্বর আবার আসতে পারে, ব্যথাটাও বাড়বে, তবে ঘাবড়াবেন না। আর হ্যাঁ, ব্যান্ডেজটা ভেজাবেন না, রোজ চারটে করে কম্বায়োটিক নেবেন।

রায়হান পাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে কেমন দিশেহারা বোধ করছেন। কিছু বুঝছেন না কী করবেন। রাস্তা অবশ্য একটাই। কিন্তু রাস্তায় ভিড় বলে মানুষ উপচে পড়ছে মাঠে। বাড়িঘরের ফাঁকে ফাঁকে উজিয়ে চলেছে সবাই। এই গায়ে-গায়ে-লাগা ঠেলাঠেলি ভিড়ের রাস্তায় গাড়িঘোড়া চলবার কোনো সম্ভাবনা নেই। তবু শোনা গিয়েছিল বাস পাওয়া যাবে। এখন শুনল বাসও আর চলছে না।

বিনু তখন প্রায় ভেঙে পড়েন। এক রকম ফুঁপিয়ে ওঠেন হতাশায়। স্বামীর কাছে অনুযোগ জানান—তোমার কি মাথা খারাপ, এভাবে যাওয়া সম্ভব? অসুস্থ ছেলেদের নিয়ে কেমন করে হাঁটব—হেঁটে কোথায় যাব?

তাহলে? রায়হান প্রশ্ন করেন, ফিরে যাবে? ফিরলে চলো, ফিরে যাই।

বিনু কী বলবেন! শুধু ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করছে তাঁর। নদীর ওপারে তাকালে বুকের ভেতরকার দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। কেমন একটা ভয়ানক কষ্ট হয়। ফেরার কোনো পথ নেই। একটি লোকও ফিরে যাচ্ছে না, শহরমুখো একটি লোক নেই। শুধু আসছে—ঘরবাড়ি দালানকোঠার ফাঁক-ফোকর দিয়ে গলে গলে পড়ছে মানুষ! পিল পিল করে ছুটে আসছে চারদিক থেকে, নদীর জলসীমায় এসে দাঁড়াচ্ছে—নদী দূর দিয়ে বাঁক

নিয়েছে, আর মানুষের একটা স্রোতও যেন অমনি একটা বাঁক নিয়ে রয়েছে।

আসগার একটা লাঠি নিয়ে এল, দেখুন এতে হবে কি না। হাসান লাঠি পেয়ে খুশি, হবে—এতেই হবে। জখম ছেলেটির উপকার করতে পেরে আসগার গর্ববোধ করে।

তারপর সে নিজের শিক্ষকের দিকে মনোযোগ দিলো। খোঁজ নিয়ে এসে জানাল, না স্যার, গাড়ির কোনো ব্যবস্থা হবে না। আর অতো ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, আপনি থেকে যান এখানে। এদিকে ভয়ের কিছু নেই—নদী পার হয়ে এদিকে আর্মি আসবে না। সবাই তো এদিকে, ছাত্রনেতারা সবাই এসে আছেন আমাদের পাড়ায়। আর ঐ যে ও-পাড়াটা দেখছেন, ঐ যে তালগাছ কটা—ঐ পাড়ায় ইউনিভার্সিটির প্রফেসররা আছেন। এখানে দুদিন থাকুন, তারপর কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তেমন দেখলে নৌকা ভাড়া করে দেব—নিরাপদ জায়গায় চলে যাবেন। আর অবস্থা খারাপ হলে কে-ই বা এখানে পড়ে থাকবে বলুন?

হাসানের কথা শুনতে পায় না আসগার। হাসান থেকে থেকেই শুধোচ্ছে—এদিকে চায়ের দোকান নেই? চায়ের দোকানটা কোন দিকে ভাই?

বিনু তখন দেখছে এক ভদ্রলোক মস্ত মস্ত দুই সুটকেস নামাচ্ছেন নৌকা থেকে। ওদিকে আরেকটা নৌকা এসে গেল। ভদ্রমহিলার হাতে একটা মুরগি। বোধহয় ঐটিই হাতের কাছে পেয়েছেন বাড়ি থেকে বেরোবার সময়ে।

রায়হান মনস্থির করতে পারেন না। মনে পড়ছে, বাড়ি থেকে বেরোবার মুহূর্তে একটি ছাত্রের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে জানিয়েছিল, যেদিক দিয়েই যান—নদীটা পার হয়ে অন্তত চলে যাবেন—যত দূর পারেন ইন্টিরিয়রে চলে যাবেন—আমরা নদীর ওপার থেকে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখব।

ভিড় ক্রমশ বাড়ছে পাড়ের ওপর। দাঁড়াবার জায়গাটুকুও থাকছে না। সরতে সরতে রাস্তায় এসে পড়েছে সবাই—এবং সেখানে আরেকটি স্রোত। ঐ অবস্থাতেই একসময় হাঁটতে শুরু করেছেন রায়হান—সেই সঙ্গে বিনু এবং ছেলে দুটি। আসগারও হাঁটছে সঙ্গে সঙ্গে। বোঝাচ্ছে, চলুন ভাবি, কিছুক্ষণের জন্যে হলেও বিশ্রাম নেবেন, কিছু মুখে দিয়ে তারপর না হয় রওনা দেবেন।

শব্দের অর্থ

আশ্বাস: ভরসা।

ইন্টিরিয়র: ভিতরের দিক।

এফেক্টেড: আক্রান্ত।

কম্বায়োটিক: এক ধরনের ওষুধ।

কাকুতি মিনতি: অনুনয়-বিনয়।

জলসীমা: জলভাগের সীমানা।

টনটন: ব্যথার ভাব।

দিশেহারা: কী করতে হবে বুঝতে না পারা।

প্রিপেয়ার্ড: প্রস্তুত।

ফাঁকফোকর: ছোটোবড়ো ছিদ্র।

বিভ্রান্ত: দিশেহারা।

মনস্থির করা: সিদ্ধান্ত নেওয়া।

মস্করা: ঠাট্টা।

সওয়ারি: আরোহী।

স্বেচ্ছাসেবক: স্বেচ্ছায় সেবাদানকারী।

২.২.১ শব্দের উচ্চারণ

'যাত্রা' গল্প থেকে কিছু শব্দ এবং এগুলোর প্রমিত উচ্চারণ নিচের ছকে দেওয়া হলো। সহপাঠীদের সঙ্গে শব্দগুলোর উচ্চারণ অনুশীলন করো এবং উচ্চারণ প্রমিত হচ্ছে কি না খেয়াল করো।

শব্দ	প্রমিত উচ্চারণ
অনিশ্চিত	অনিশ্চিত্
অন্তত	অন্‌তোতো
অসংখ্য	অশোঙ্‌খো
আগ্রহ	আগ্‌গ্রোহো
আত্মীয়	আত্‌তিয়োঁ
উদ্বিগ্ন	উদ্‌বিগ্‌নো
অধীর	অধির্
কাণ্ড	কান্‌ডো
কিছুক্ষণ	কিছুক্‌খন্
কুণ্ডলী	কুন্‌ডোলি
গাড়ি-ঘোড়া	গাড়ি-ঘোড়া
জলসীমা	জল্‌শিমা
ঠেলাঠেলি	ঠ্যালাঠেলি
ততক্ষণ	ততোক্‌খন্
নির্ঘুম	নির্‌ঘুম্
প্রলেপ	প্রোলেপ্
ফাঁক-ফোকর	ফাঁক্-ফোকোর্
বিশ্রাম	বিস্‌স্রাম্
ভয়ানক	ভয়ানোক্
মনস্থির	মনোস্‌থির্
মন্তব্য	মন্‌তোব্‌বো
সাহস	শাহোশ্

২.২.২ ভাষারূপের পরিবর্তন

'যাত্রা' গল্পের কথোপকথনের কয়েকটি জায়গায় আঞ্চলিক ভাষারীতির প্রয়োগ করা হয়েছে। গল্প থেকে এ রকম কয়েকটি বাক্য নিচের ছকের বাম কলামে লেখো এবং ডান কলামে বাক্যগুলোর প্রমিত রূপ নির্দেশ করো। কাজ শেষে সহপাঠীদের সঙ্গে উত্তর নিয়ে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো। একটি করে দেখানো হলো।

আঞ্চলিক বাক্য	প্রমিত রূপ
১. আস্তে আস্তে, ভিড় কইরো না, আর উইঠেন না—নাও ডুববো কইলাম।	আস্তে আস্তে, ভিড় কোরো না, আর উঠবেন না—নৌকা ডুবে যাবে বলছি।
২.	
৩.	
৪.	
৫.	
৬.	
৭.	
৮.	
৯.	
১০.	

ভাষার প্রমিত ও অপ্রমিত রূপ

অঞ্চলভেদে ভাষার ভিন্ন ভিন্ন রূপ থাকে। ভাষার এই রূপ-বৈচিত্র্যকে বলে আঞ্চলিক ভাষা। বাংলাদেশে বাংলা ভাষার অনেকগুলো আঞ্চলিক রূপ আছে। যেমন: খুলনার আঞ্চলিক ভাষা, নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষা, সিলেটের আঞ্চলিক ভাষা, ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষা, চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা, বরিশালের আঞ্চলিক ভাষা, রংপুরের আঞ্চলিক ভাষা ইত্যাদি। কোনো শব্দ অঞ্চলভেদে আলাদাভাবে উচ্চারিত হতে পারে, কিংবা একই অর্থে আলাদা শব্দের প্রয়োগ হতে পারে। বাক্যের গঠনও অনেক সময়ে আলাদা হয়। আঞ্চলিক ভাষা সাধারণত মানুষের প্রথম ভাষা—এই ভাষাতেই মানুষ কথা বলা শুরু করে এবং ক্রমে সে প্রমিত ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত হয়। গল্প-উপন্যাস-নাটকে বিভিন্ন চরিত্রের মুখে আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ দেখা যায়। তাতে ঐসব চরিত্র অধিক বিশ্বস্ত ও বাস্তব হয়ে ওঠে।

ভাষার এই আঞ্চলিক রূপ বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগে কিছু সমস্যা তৈরি করে। সেই সমস্যা দূর করার জন্য ভাষার একটি রূপকে প্রমিত হিসেবে গ্রহণ করা হয়, যাতে সব অঞ্চলের মানুষ তা সহজে বুঝতে পারে। একই কারণে দেশের যাবতীয় আনুষ্ঠানিক যোগাযোগে, শিক্ষা কার্যক্রমে, দাপ্তরিক কাজে, গণমাধ্যমে, সাহিত্যকর্মে ভাষার প্রমিত রূপ ব্যবহৃত হয়। ভাষার এই সর্বজনগ্রাহ্য রূপের নাম প্রমিত ভাষা।

প্রমিত ভাষার দুটি রূপ আছে: কথ্য প্রমিত ও লেখ্য প্রমিত। কথ্য প্রমিত ব্যবহৃত হয় আনুষ্ঠানিকভাবে কথা বলার সময়ে, অন্যদিকে লেখ্য প্রমিত ব্যবহৃত হয় লিখিত যোগাযোগের কাজে।

৩য় পরিচ্ছেদ

লিখিত ভাষায় প্রমিত রীতি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) একজন বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক। তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস ‘পথের পাঁচালি’। এই উপন্যাস থেকে সত্যজিৎ রায় একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন যা আন্তর্জাতিক খ্যাতি পায়। বিভূতিভূষণের উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে ‘অপরাজিত’, ‘আরণ্যক’, ‘চাঁদের পাহাড়’, ‘ইছামতী’, ‘অশনি সংকেত’ ইত্যাদি। নিচের অংশটুকু ‘পথের পাঁচালি’ থেকে নেওয়া।

রেলের পথ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অপু জন্মিয়া অবধি কোথাও কখনো যায় নাই। এ গাঁয়েরই বকুলতলা, গোঁসাইবাগান, চালতেতলা, নদীর ধার, বড়ো জোর নবাবগঞ্জ যাইবার পাকা সড়ক—এই পর্যন্ত তাহার দৌড়। মাঝে মাঝে বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ মাসে খুব গরম পড়িলে বৈকালে দিদির সঙ্গে নদীর ঘাটে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। আজ সেই অপু সর্বপ্রথম গ্রামের বাহিরে পা দিল। কয়েকদিন হইতেই উৎসাহে তাহার রাত্রিতে ঘুম হওয়া দায় হইয়া পড়িয়াছিল। দিন গনিতে গনিতে অবশেষে যাইবার দিন আসিয়া গেল।

তাহাদের গ্রামের পথটি বাঁকিয়া নবাবগঞ্জের সড়ককে ডাইনে ফেলিয়া মাঠের বাহিরে আষাঢ়ু দুর্গাপুরের কাঁচা রাস্তার সঙ্গে মিশিয়াছে। দুর্গাপুরের রাস্তায় উঠিয়াই সে বাবাকে বলিল—বাবা যেখান দিয়ে রেল যায়, সেই রেলের রাস্তা কোন দিকে? তাহার বাবা বলিল—সামনেই পড়বে এখন, চল না! আমরা রেললাইন পেরিয়ে যাব এখন।

সেবার তাদের রাঙ্গী-গাইয়ের বাছুর হারাইয়াছিল। নানা জায়গায় দুই-তিন দিন ধরিয়া খুঁজিয়াও কোথাও পাওয়া যায় নাই। সে তাহার দিদির সঙ্গে দক্ষিণ মাঠে বাছুর খুঁজিতে আসিয়াছিল।

তাহার দিদি পাকা রাস্তার ওপারে বহুদূর ঝাপসা মাঠের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কী দেখিতেছিল, হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল—এক কাজ করবি অপু, চল যাই আমরা রেলের রাস্তা দেখে আসি, যাবি?

অপু বিস্ময়ের সুরে দিদির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—রেলের রাস্তা, সে যে অনেক দূর! সেখানে কী করে যাবি?

তাহার দিদি বলিল—বেশি দূর বুঝি! কে বলেছে তোকে? ঐ পাকা রাস্তার ওপারে তো!

অপু বলিল—কাছে হলে তো দেখা যাবে। পাকা রাস্তা থেকে দেখা যায় যদি, চল গিয়ে দেখি।

দুইজনে অনেকক্ষণ নবাবগঞ্জের সড়কে উঠিয়া, চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার দিদি বলিল—বড্ড অনেক দূর, বোধ হয় যাওয়া যাবে না! কিছু তো দেখা যায় না—অত দূরে গেলে আবার আসব কী করে?

তাহার সতৃষ্ণ দৃষ্টি কিন্তু দূরের দিকে আবদ্ধ ছিল; লোভও হইতেছিল, ভয়ও হইতেছিল। হঠাৎ তাহার দিদি মরিয়াভাবে বলিয়া উঠিল—চল যাই, গিয়ে দেখে আসি অপু—কতদূর আর হবে? দুপুরের আগে ফিরে আসব এখন। হয়তো রেলের গাড়ি দেখা যাবে এখন। মাকে বলব বাছুর খুঁজতে দেরি হয়ে গেল।

প্রথম তাহারা একটুখানি এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল—কেহ তাহাদিগকে লক্ষ করিতেছে কি না। পরে পাকা রাস্তা হইতে নামিয়া পড়িয়া দুপুর রোদে ভাইবোনে মাঠ-বিল-জলা ভাঙ্গিয়া সোজা দক্ষিণ মুখে ছুটিল।

দৌড়, দৌড়, দৌড়—

পরে যাহা হইল, তাহা সুবিধাজনক নয়, খানিক দূরে গিয়া একটা বড়ো জলা পড়িল একেবারে সামনে—হোগলা আর শোলা গাছে ভরা; এইখানে আসিয়া তাহারা পথ হারাইয়া ফেলিল। কোনো গ্রামও চোখে পড়ে না—সামনে ও দুপাশে কেবল ধানখেত, জলা আর বেতঝোপ। ঘন বেতবনের ভিতর দিয়া যাওয়া যায় না, পাঁকে পা পুঁতিয়া যায়। শেষে রৌদ্র এমন বাড়িয়া উঠিল যে, শীতকালেও তাহাদের গা দিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। দিদির পরনের কাপড় কাঁটায় নানা স্থানে ছিঁড়িয়া গেল, তাহার নিজের পায়ের তলা হইতে দু-তিনবার কাঁটা টানিয়া টানিয়া বাহির করিতে হইল। শেষে রেলরাস্তা দূরের কথা, বাড়ি ফিরাই মুশকিল হইয়া উঠিল। অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে, পাকা রাস্তাও আর দেখা যায় না। জলা ভাঙ্গিয়া ধানখেত পার হইয়া যখন তাহারা বহু কষ্টে আবার পাকা রাস্তায় উঠিয়া আসিল, তখন দুপুর ঘুরিয়া গিয়াছে। বাড়ি আসিয়া তাহার দিদি ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা কথা বলিয়া তবে নিজের ও তাহার পিঠ বাঁচাইল।

সেই রেলের রাস্তা আজ এমনি সহজভাবে সামনে পড়িবে—সেজন্য ছুটিতে হইবে না, পথ হারাইতে হইবে

না—বকুনি খাইতে হইবে না!

কিছুদূর গিয়া সে বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া দেখিল নবাবগঞ্জের পাকা সড়কের মতো একটা উঁচুমতো রাস্তা মাঠের মাঝখান চিরিয়া ডাইনে-বাঁয়ে বহুদূর গিয়াছে। রাঙ্গা রাঙ্গা খোয়ার রাশি উঁচু হইয়া ধারের দিকে সারি দেওয়া। সাদা সাদা লোহার খুঁটির উপর যেন একসঙ্গে অনেক দড়ির টানা বাঁধা; যতদূর দেখা যায় ঐ সাদা খুঁটি ও দড়ির টানা বাঁধা দেখা যাইতেছে।

তাহার বাবা বলিল—ঐ দেখ খোকা রেলের রাস্তা।

অপু একদৌড়ে ফটক পার হইয়া রাস্তার উপর আসিয়া উঠিল। পরে সে রেলপথের দুই দিকে বিস্ময়ের চোখে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। দুইটা লোহা বরাবর পাতা কেন? ... উহার উপর দিয়া রেলগাড়ি যায়? ... কেন? ... মাটির উপর দিয়া না গিয়া লোহার উপর দিয়া যায় কেন? ... পিছলাইয়া পড়িয়া যায় না কেন? ... ওগুলোকে তার বলে? তারের মধ্যে সোঁ সোঁ কীসের শব্দ? ... তারে খবর যাইতেছে? ... কাহারা খবর দিতেছে? ... কী করিয়া খবর দেয়? ... ওদিকে কি ইস্টিশান? এদিকে কি ইস্টিশান?—কিছুক্ষণ এইভাবে ক্রমাগত প্রশ্ন চলিল।

শেষে অপু বলিল—বাবা, রেলগাড়ি কখন আসবে? আমি রেলগড়ি দেখব বাবা।

—রেলগাড়ি এখন কী করে দেখবে? সেই দুপুরের সময়ে রেলগাড়ি আসবে, এখনো চার-পাঁচ ঘণ্টা দেরি।

—তা হোক বাবা, আমি দেখে যাব, আমি কখ্খনো দেখিনি। হ্যাঁ বাবা?

—ও রকম কোরো না, ঐজন্যে তো তোমায় কোথাও আনতে চাইনে—এখন কী করে দেখবে? সেই দুপুর অবধি বসে থাকতে হবে তাহলে এই ঠায় রোদ্দুরে! চল, আসবার দিন দেখাব। অপুকে অবশেষে জলভরা চোখে বাবার পিছনে পিছনে অগ্রসর হইতে হইল।

শব্দের অর্থ

অগ্রসর: সামনে যাওয়া।

অবধি: পর্যন্ত।

আবদ্ধ থাকা: আটকে থাকা।

একদৃষ্টে: অপলক চোখে।

গনিতে গনিতে: গুনতে গুনতে।

ঝাপসা: অস্পষ্ট।

ফটক: সদর দরজা।

রাঙ্গী গাই: লাল রঙের গাভি।

শোলা গাছ: জলাভূমিতে উৎপন্ন গুল্ম জাতীয় গাছ।

সতৃষ্ণ দৃষ্টি: আগ্রহী চোখ।

হোগলা: জলাভূমিতে উৎপন্ন তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ।

২.৩.১ লিখিত গদ্যে প্রমিত ভাষার ব্যবহার

‘রেলের পথ’ গল্প থেকে সর্বনাম শব্দ খুঁজে বের করো এবং নিচের ছকের বাম কলামে লেখো। এরপর সর্বনামগুলোর প্রমিত রূপ ডান কলামে লেখো। কাজ শেষে সহপাঠীদের সঙ্গে মিলিয়ে নাও এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো। একটি নমুনা উত্তর করে দেওয়া হলো।

গল্পে ব্যবহৃত সর্বনাম শব্দ	শব্দের প্রমিত রূপ
তাহার	তার

একইভাবে গল্প থেকে ক্রিয়া শব্দ খুঁজে বের করো এবং নিচের ছকের বাম কলামে লেখো। এরপর ক্রিয়াগুলোর প্রমিত রূপ ডান কলামে লেখো। কাজ শেষে সহপাঠীদের সঙ্গে মিলিয়ে নাও এবং প্রয়োজনে সংশোধন করো। একটি নমুনা উত্তর করে দেওয়া হলো।

গল্পে ব্যবহৃত ক্রিয়া শব্দ	শব্দের প্রমিত রূপ
আসিয়াছিল	এসেছিল

সাধুরীতি

সাধুরীতি হলো লিখিত বাংলা ভাষার একটি সেকেলে রূপ। এই রীতিতে কেউ কথা বলত না, এটি ছিল কেবল লেখার ভাষা। এক সময়ে লিখিত ভাষার আদর্শ রূপ হিসেবে এটি ব্যবহৃত হতো। এই রীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়া শব্দের রূপ মুখের ভাষার তুলনায় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। উনিশ ও বিশ শতকের প্রচুর সাহিত্যকর্ম এই রীতিতে লেখা হয়েছে। ১৯৭২ সালে গৃহীত বাংলাদেশের সংবিধানও সাধুরীতিতে রচিত। ‘রেলের পথ’ গল্পটি সাধুরীতির একটি নমুনা।

২.৩.২ সাধুরীতির বাক্যকে প্রমিত বাক্যে রূপান্তর

‘রেলের পথ’ গল্প থেকে সাধুরীতির কয়েকটি বাক্য নিচের ছকে লেখো এবং একইসঙ্গে বাক্যগুলোকে প্রমিত গদ্যরীতিতে রূপান্তর করো। কাজ শেষে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করো এবং প্রয়োজনে সংশোধন করে নাও। একটি নমুনা-উত্তর করে দেওয়া হলো।

সাধুরীতির বাক্য	প্রমিত রূপ
১. দিন গনিতে গনিতে অবশেষে যাইবার দিন আসিয়া গেল।	১. দিন গুনতে গুনতে অবশেষে যাওয়ার দিন এসে গেল।
২.	২.
৩.	৩.
৪.	৪.
৫.	৫.
৬.	৬.
৭.	৭.
৮.	৮.
৯.	৯.
১০.	১০.

২.৩.৩ দৈনন্দিন জীবনে প্রমিত ভাষার চর্চা

নিচের বিষয়গুলো প্রমিত ভাষায় উপস্থাপন করতে হবে। প্রথমে তার একটি লিখিত খসড়া তৈরি করো। তারপরে প্রমিত উচ্চারণে সেগুলো পাঠ করো।

১. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা আলোচনা অনুষ্ঠান সঞ্চালনা

২. স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস কিংবা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বক্তৃতা

৩. টেলিভিশন বা রেডিওর সংবাদ উপস্থাপন

৪. নিজের কোনো অভিজ্ঞতার বিবরণ

৫. লাইব্রেরিয়ান, ডাক্তার বা অপরিচিত লোকের সঙ্গে আলাপ।